ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের সূচনা পর্ব

*মোহাম্মদ আব্দুস সবুর

সারসংক্ষেপ: বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার শুরু হয় দুশো বছর আগে থেকে। শিক্ষা-দানের লক্ষ্যে উনিশ শতকের শুরুতেই মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার শুরু হয়। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সূত্রে এদেশে পাঠদানের উদ্দেশ্যে প্রথম পাঠ্যপুস্তকের সূচনা হয়। এই পাঠ্যপুস্তকগুলো ছিল বয়স্কদের পাঠোপযোগী। শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের সূচনা আরও পরে। আলোচ্য নিবন্ধে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তক, মিশনারিদের শিক্ষা উদ্যোগ এবং উনিশ শতকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য শিশু পাঠ্যপুস্তক বা প্রাইমার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১. ভূমিকা

বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের সূচনা উনিশ শতকের শুরুতেই। উনিশ শতকের আগে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের প্রচলন ছিল না। তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল শ্রুতিনির্ভর। গুরুর হাতে বই থাকত শিক্ষার্থীরা শুনে শুনে শিখতো। সব শিক্ষার্থীর হাতে বই থাকার ধারণাই তখন ছিল না আর তা সম্ভবও ছিল না।এক সঙ্গে অনেক বই ছাপানোর প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর থেকে ইউরোপে পাঠ্যপুস্তকের ধারণা বিকশিত হয়। চতুর্দশ শতকে জার্মানিতে গুটেনবার্গে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে পুস্তক রচনা সহজ হয়। ইউরোপীয়দের হাত ধরে এদেশে পুস্তক রচনার সূচনা হয়। প্রথমে তারা ধর্মপ্রচার ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বই প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় মিশনারিরা বুঝতে পারে দেশীয়দের শিক্ষিত না করলে ধর্মপ্রচারে সুবিধা করা যাবে না। তাই তারা শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হয়। নিজেরা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং দেশীয় শিক্ষার কেন্দ্র পাঠশালা শিক্ষাকে সংস্কারে সরকারকে সাহায্য করে। অন্যদিকে ভারতবর্ষকে শাসন করার জন্য ইংরেজদের ভারতীয় ভাষা শেখা জরুরি হয়ে পড়ে। ইংরেজ সিভিলিয়ানদেরকে এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করার জন্য ইংরেজ সরকার কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। এ কলেজের প্রয়োজনেই এদেশে পাঠ্যপুস্তক রচনা শুরু হয়। যদিও এই পাঠ্যপুস্তকগুলো সে অর্থে ছাত্রপাঠ্য ছিল না। তবে এ ঘটনা এদেশের পাঠ্যপুস্তক রচনার ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে মূলত শিশুপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক রচনা শুরু হয়। এই উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিচিতি দান করাই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

২. ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্য

উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা শুরু হওয়ার আগে আঠারো শতকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র কেমন ছিল তা জানা জরুরি। আঠারো শতকের শেষ দিকে এডওয়ার্ড ইভ্‌স লন্ডন থেকে এদেশে আসেন। তিনি তাঁর বইতে উল্লেখ করেন যে, ১৭৫৬-৫৭ সালে বাংলায় লেখাপড়া শেখার অনেক পাঠশালা ছিল। তিনি জানান যে এসব প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু শেখানো হতো না। ১৭৯১ সালে ক্রফোডের বর্ণনাতে ইভ্‌সের এ বিবরণের

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

সমর্থন মেলে। তাঁর মতে তখন সব শহরে ও প্রধান শহরগুলোতে শিশুদের লেখাপড়ার স্কুল ছিল। ১৭৯০ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, এ সময়ে কলকাতায় শিশুদের ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। তবে আঠারো শতকে ইংরেজি শিক্ষার অবস্থা শোচনীয় ছিল। পূর্ণচন্দ্র দে তাঁর 'সেকালে কলকাতায় ইংরেজি স্কুল' প্রবন্ধে ১৭৭৫ সাল পর্যন্ত এদেশে ইংরেজি শিক্ষার দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন। তবে ইংরেজি শিক্ষার চেষ্টা পলাশী যুদ্ধের ত্রিশ বছর আগে থেকে শুরু হয়েছিল। ১৭২৭ সালে উমিচাঁদ কলকাতায় প্রথম ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপীয় প্রোটেস্ট্যান্ট শিশুদের শিক্ষার জন্য এটি স্থাপিত হয়। ১৭৫৮ সালে দ্বিতীয় ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। এটি স্থাপন করেন জন কিয়েরনানডার। কিয়েরনানডারের স্কুলে দেশীয় ও ইউরোপীয় খ্রিস্টান শিশুরা পড়তো। ১৭৫৯ সালে এই স্কুলে ১৭৫ জন শিক্ষার্থী ছিল। আঠারো শতকের শেষভাগে কলকাতার কুলিবাজারে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একাধিক ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমবর্ধমান ইংরেজ শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনে এগুলো গড়ে ওঠে। নরেন্দ্রনাথ লাহা এ স্কুলগুলোকেই মাশরুম স্কুল বলে অভিহিত করেছেন। এ স্কুলগুলোই ছিল কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের প্রথম পর্যায়। আঠারো শতকের শেষদিকে এসে ইংরেজরা উপলব্ধি করলো বাংলা ভাষা জানা দরকার এবং তা ক্রমবর্ধমান পুঁজির প্রয়োজনে। অবশ্য মিশনারিরা আগে থেকেই এ চেষ্টা করছিল। সেখানেও প্রথম দিকে ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ খোঁজা গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৭৯৩ সালে ইংরেজি-বাংলা ভোকেবুলারি নামে একটি অভিধান ক্রনিকল প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল।[১]

১৭৫৭ সালের পর ইংরেজরা বঙ্গদেশ তথা পুরো ভারতবর্ষ দখল করে। শাসনকার্য চালাতে গিয়ে তারা বুঝতে পারে বঙ্গদেশের শতকরা ষাটভাগের অধিক লোক বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝে না। এমনকি তারা সুদীর্ঘ কালের রাজভাষা ফারসি ভাষাও রপ্ত করতে পারেনি। ১৭৭৪ সালে কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবেও এ নগরী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলত স্থানীয়দের সঙ্গে শাসকদের ভাষিক যোগাযোগ জরুরি হয়ে পড়ে। কেননা স্থানীয়দের ভাষা না জানার কারণে শাসনকার্য ও ব্যবসা বাণিজ্য ঠিকভাবে চালানো যাচ্ছিলো না। ফলে স্থানীয়দের ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে পড়ে। তার আগে মিশনারিরা এ সমস্যার মুখোমুখি হয়। তারা দেখলো ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনে দেশীয়দের ভাষা জানা দরকার। পাশাপাশি দেশীয়দের শিক্ষিত করা দরকার। খ্রিস্টের বাণী তাদের অন্তরে পৌঁছানোর জন্য দেশীয় ভাষায় বাইবেল ছাপানোর কোনো বিকল্প ছিল না। এ কারণে দেখা যায় বাংলা ভাষায় রচিত প্রাথমিক বইগুলো আইন, অভিধান, ব্যাকরণ ও খ্রিস্ট ধর্মবিষয়ক। একদিকে ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনে অন্যদিকে প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বই প্রকাশের প্রয়োজনে ছাপাখানার চাহিদা ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। ১৭৬৮ সাল পর্যন্ত কলকাতায় কোনো প্রেস ছিল না। ১৭৭৭ সালে বঙ্গদেশে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জেমস অগাস্টাস হিকি নামক এক ইংরেজ ভাগ্যান্বেষী এটির স্থাপয়িতা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু কাগজপত্র ও একাধিক পঞ্জিকা মুদ্রণ এই ছাপাখানার কৃতিত্ব। প্রায় একই সময়ে হুগলিতে আরও একটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়। এই

প্রেসের নাম মিস্টার অ্যান্ড্রুর প্রেস। বাংলা ভাষা ও ছাপাখানার উন্নয়নে এই প্রেসের অবদান সবচেয়ে বেশি। নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের *A Grammar of The Bengalee Language* বইটি ১৭৭৮ সালে এই ছাপাখানায় প্রকাশিত হয়। এটি বঙ্গদেশে বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত বই। এরপর আইন কানুন, অভিধান, ধর্মীয় বইপত্র প্রকাশিত হয়।[২]

৩. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে ফোর্ট উইলিয়াম পর্ব

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগে শিক্ষা দানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কোনো পাঠ্যপুস্তক ছাপা হয়নি। ১৭৯৮ সালে লর্ড মর্নিংটন(মারকুইস অব ওয়েলেসলি) ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হিসেবে কলকাতায় আসেন। এসেই তিনি লক্ষ করলেন যে, কোম্পানির দায়িত্বপূর্ণ পদের ভার নিয়ে যারা এদেশে আসেন তারা চৌদ্দ থেকে আঠারো বছর বয়স্ক অপরিণত যুবক। স্বদেশেই যাদের অনেকের শিক্ষা সমাপ্ত হয়নি। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তারা সহজেই দুর্নীতিগ্রস্ত পূর্বসূরিদের মতো বিপথগামী হতো।[৩] ১৮০০ সালের দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষাদানের প্রয়োজন অনুভব করে। ১৮০০ সালেই গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লির আদেশে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। তার পরের বছর ১৮০১ সালে উইলিয়াম কেরিকে বাংলা বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যোগদান করে কেরি দেখলেন বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের উপযোগী কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। এমনকি তিনি বাংলা গদ্যের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন না। কেরির অনুরোধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং পণ্ডিতগণের সহযোগে তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড জে. লঙের *Selections from the Records of the Government Published by Authority.* No.xxxlii প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের পরিশিষ্টে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ব্যবহারের জন্য গভর্নমেন্টের ক্রয়কৃত বইয়ের তালিকা আছে। তালিকায় ত্রিশের বেশি বইয়ের নাম আছে।[৪]

কেরির অনুরোধে ও তাগাদায় সহকারী পণ্ডিত রামরাম বসু *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* নামক একটি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ১৮০১ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এটি বাঙালি লিখিত বাংলায় মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গদ্যের বই। এটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঠ্য হয়েছিল। শিশুপাঠ্য না হলেও সচেতন প্রচেষ্টায় রচিত প্রথম পাঠ্যপুস্তক এটি।[৫] কেরি নিজেও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ১৮০১ সালে তাঁর বাংলা ব্যাকরণ A *Grammar of Bengalee Language* শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। নামকরণ থেকে বোঝা যায় বইটি ইংরেজিতে লেখা। পরবর্তী কালে অবশ্য এর বঙ্গানুবাদ বের হয়েছিল। এতে এগারোটি অধ্যায় ছিল: বর্ণপরিচয়, যুক্তবর্ণ, শব্দ ও তার ভিন্ন রূপ, গুণবাচক শব্দ, সর্বনাম, ক্রিয়াপদ, শব্দগঠন, সমাস, অব্যয় ও উপসর্গ, সন্ধি প্রকরণ ও অন্বয়। এর বাইরে বইয়ের শেষে এতে সংখ্যাবাচক শব্দ, ওজন ও মাপের বিভাগ, বারো মাস ও তিথির হিসাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরবর্তী কালে বাংলা প্রাইমার ও বর্ণপরিচয় গ্রন্থসমূহ প্রণয়নে এই বইটিকে অনুসরণ করা হয়েছে। তাই বাংলা শিশুপাঠ্য পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাসে বইটি পথিকৃতের ভূমিকা পালন

করেছে। স্কুল বুক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের *বাঙ্গালা শিক্ষা গ্রন্থ*টিতে কেরির ব্যাকরণের অনুরূপ বিষয়গুলোর আলোচনা আছে।

বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব পূরণে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার *বত্রিশ সিংহাসন* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। দশম থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রচলিত আখ্যানসমগ্র 'সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা' এর সরল বাংলা অনুবাদ করেন বিদ্যালঙ্কার। বইটিতে তিনি রসসঞ্চার করতে পেরেছিলেন। বইটি ছাত্রপাঠ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। ১৮১৭ সালের আগে এর তিনটি সংস্করণ বের হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই বইটির তেমন চাহিদা ছিল না।

১৮০২ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে *লিপিমালা* নামে আরও একটি ছাত্রপাঠ্য বই প্রকাশিত হয়। এর লেখক ছিলেন রামরাম বসু। ইংরেজ সিভিলিয়ান ছাত্রদের বাংলায় চিঠিপত্র লেখার সাথে পরিচয় ঘটানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। এতে চল্লিশটি পত্র স্থান পেয়েছে। পুরাণ, উপকথা, গালগল্প পত্রের আকারে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

১৮০৩ সালে তারিণীচরণ মিত্র *Aesop's Fables* বাংলায় অনুবাদ করেন। এর বানানে তারিণীচরণ বাঙালির উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নীতি উপদেশমূলক গল্পের মাধ্যমে এটিকে ছাত্রপাঠ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তারিণীচরণের অনুবাদ সহজবোধ্য হয়েছিল তবে গল্পরসের অভাবে বইটি পাঠককে বেশি দিন আকৃষ্ট করতে পারেনি।[৬]

১৮০৫ সালে রচিত চণ্ডীচরণ মুন্সীর *তোতা ইতিহাস* একটি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক। এটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ব্যবহৃত হয়েছে। কাদির বক্স রচিত ফারসি গ্রন্থ *তুতিনামা*কে বাংলায় অনুবাদ করেন চণ্ডীচরণ। কেরির সুপারিশে এটি কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে পাখির মুখ দিয়ে মানুষের ভাষায় গল্প বলা হয়েছে। বইটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এর একাধিক সংস্করণ লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ *রাজাবলী* প্রকাশিত হয় ১৮০৮ সালে। এর রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এই বইয়ে কলির প্রথম থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত রাজাদের কালানুক্রমে আলোচনা করা হয়েছে। এর তথ্যের সত্যতা প্রশ্নাতীত না হলেও এটি ছাত্রদের জন্য যথেষ্ট উপযোগী হয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয়ের *প্রবোধচন্দ্রিকা* নামে আরও একটি বই। এটি সে সময়ে কলেজের সিনিয়র ডিভিশনে পাঠ্য ছিল। এটি শিশুপাঠ্য ছিল না, তবে এতে ভবিষ্যতের শিশুপাঠ্যপুস্তক রচনার ইঙ্গিত ছিল। কেরির অনুরোধে এই বইটিও কলেজের পাঠ্য হয়। এটি পরবর্তী কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই হিসেবে পুনর্মুদ্রিত হয়। এটি ১৮৩৩ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সরস ভাষায় রচিত- এই বইটি পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও সমাদৃত হয়েছিল।[৭]

৪. মিশনারিদের শিক্ষা উদ্যোগ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাথমিক উদ্যোগের পর মিশনারিরা দেশীয়দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে মনোযোগ দেয়। এদিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্বও কমতে থাকে। কারণ অভিন্ন উদ্দেশ্যে ১৮০৭ সালে ইংল্যান্ডে হেলিবেরি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশনারিরা লক্ষ করেন যে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পাঠ্যপুস্তকবিহীন অনেকটা শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর। তাই তাঁরা ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে এদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে পাঠশালা থেকে স্কুলে উত্তরণের ঘটনা অনেক গুরুত্ববহ। কেননা পাঠশালা ছিল আবহমান বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র। বর্তমান স্কুল থেকে পাঠশালা শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পাঠশালার শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অনানুষ্ঠানিক। পাঠশালা শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর অগ্রগতি গুরুর উপর নির্ভর করতো। নির্দিষ্ট সিলেবাস, সময়সূচি, পাঠদান-কৌশল কিছুই ছিল না। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দেশীয় পাঠশালাগুলোকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়। মিশনারিরা কেবল কলকাতায় নয় প্রত্যন্ত জেলাগুলোতেও শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট ছিল। বাংলার বিভিন্ন স্থানে তারা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। কলকাতা ছাড়া অন্য আরও তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র এ সময় গড়ে ওঠে। শ্রীরামপুর মিশন শ্রীরামপুরে, লন্ডন মিশনারি সোসাইটি চিনসুরা ও আশেপাশের এলাকা আর চার্চ মিশনারি সোসাইটি বর্ধমানে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম গড়ে তোলে। এদের মধ্যে কেবল শ্রীরামপুর মিশনারিরা স্কুলের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছিল। অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির বইয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। মিশনারিদের শিক্ষা কার্যক্রম পশ্চিমবাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্টদের স্কুল প্রতিষ্ঠার দিকে বেশি মনোযোগ ছিল। ১৮১৮ সালের পর তারা দেশীয় পাঠশালাগুলোর উন্নয়নে মনোযোগ দেয় এবং এসব প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তকের প্রচলন করে।

মিশনারিগণ রিডিং, রাইটিং ও অ্যারিথমেটিক ভিত্তিক লানক্রাস্টার ও বেল প্রণীত মনিটোরিয়াল পদ্ধতি গ্রহণ করে। মার্শম্যান বাংলা বর্ণমালা, শব্দ, ক্রিয়া-বিশেষ্য-সর্বনামের উদাহরণমালা, বাক্য, সংখ্যা ও পাটিগণিতের উদাহরণ সংবলিত একটি সারণি রচনা করেন। এটি শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত সারণি স্কুলের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখা হতো। পঠনপাঠনে এই সারণি মনিটররা ব্যবহার করতো। পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন অংশ পর্যায়ক্রমে ভাগ করে পাঠ দান করা হতো। ঈশপস ফেবলস ও ঐতিহাসিক কাহিনি পাঠ্যভুক্ত করা হয়। পাটিগণিত বিশেষ করে জমিদারির হিসাব সংক্রান্ত বিষয়াদি, বিভিন্ন সত্য ঘটনা অবলম্বনে কাহিনি সংকলন দিগদর্শন, সংস্কৃত-সাহিত্যের সারাংশ পাঠ্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাছাড়া সৌরজগৎ, মানচিত্রসহ ভূগোল, কালানুক্রমিক ইতিহাসও পাঠ্যতালিকায় ছিল। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, মিশনারিরা দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বেশ পরিবর্তন করে শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের সংযোজন ঘটায়। পাঠশালার চেয়ে তাদের স্কুলের কার্যধারা ও পাঠ্যবিষয় বিস্তৃত ছিল। পাঠ্যবিষয়ে বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাস যুক্ত করে। তারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। তারা নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে গ্রামের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষণ শেষে গ্রামের শিক্ষকরা তাদের নিজ নিজ

স্কুলে ফিরে যেতো। এক কথায় বলা যায় যে মিশনারিরা ক্লাসরুমে ব্যবহার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে। তারা প্রচলিত পাঠশালার চেয়ে উন্নত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। সর্বোপরি তারা মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মার্শম্যানের উক্তি স্মর্তব্য, তিনি বলেছিলেন যে, জনগণকে তাদের নিজের ভাষার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষায় উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের আশা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্তিকর।

মিশনারিদের শিক্ষা কার্যক্রম কলকাতা, শ্রীরামপুর, চিনসুরা ও বর্ধমানের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অ্যাডামের পরিসংখ্যান থেকে মিশনারিদের কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা সরকার পাঠশালা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাতে থাকে। ১৮১৩ সালের আইনের পর সরকারের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দোদুল্যমানতা কাজ করেছে। সরকার সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালিয়ে নিবে না কি পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু করবে। সরকার দেশীয় শিক্ষার অবস্থা জানতে অ্যাডামকে জরিপের দায়িত্ব দেয়। এছাড়া দেশীয় শিক্ষার ব্যাপারে সরকার তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। বস্তুত সরকার পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে অবস্থান নেয়। ভবিষ্যতের জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলার দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভিত্তি হিসেবে রাখার পক্ষে অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে যুক্তি দেখান। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে তিনি চারটি সংস্কার প্রস্তাব করেন। যথা–

১. স্কুলে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা;
২. দেশীয় স্কুলগুলোতে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার চালু করা;
৩. ঐ পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষকদের জ্ঞান যাচাই ও সময়ে সময়ে তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং
৪. পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষকদেরকে পুরস্কৃত করা।

সরকার অ্যাডামের সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি। তার পরিবর্তে সরকার পরিশ্রুতকরণ প্রক্রিয়া মতবাদ গ্রহণ করে। এই মতবাদীরা বিশ্বাস করতো উচ্চ শ্রেণির লোকদের শিক্ষা দিলেই চলবে, উপর দিক থেকে শিক্ষা আস্তে আস্তে নিচের দিকে চুইয়ে পড়বে। সে অনুযায়ী সরকার বড় বড় শহরে সমাজের উচ্চ-শ্রেণির শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করে। ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ লর্ড বেন্টিক ইংরেজি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা সদর দপ্তরে জিলা স্কুল খোলা হয়। স্কুলগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি মাধ্যমে ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা দেন যে এই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা নেওয়া শিক্ষার্থীরা চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। তাঁর সময়ে বাংলা প্রেসিডেন্সির সাতটি বিভাগে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর, কটক, পাটনা ও ভাগলপুরে মোট ১০১টি গ্রামীণ স্কুল খোলা হয়। এসব স্কুলে দেশীয় ভাষায় পড়ালেখা, পাটিগণিত, ভূগোল এবং ভারত ও বাংলার ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সর্ব নিম্নস্তরের পাঠ্যক্রমে বর্ণমালা পড়া ও লেখা, যুক্তাক্ষর ও সংখ্যা শেখানো হতো। পর্যায়ক্রমে পাঠ্যপুস্তকের সাথে ছাত্রদের পরিচয় ঘটানো হতো। মুখে পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীরা পাঠে ব্যবহৃত শব্দগুলো বারবার লিখে বানান শিখতো। উপরের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের রচনা, পত্রলেখা, ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, শব্দের বানান এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলোর পারস্পারিক সম্পর্কের নির্দেশ করা শিখানো হতো।[৮]

৫. শিশুপাঠ্য পাঠ্যপুস্তকের সূচনা

উনিশ শতকের শুরুতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তক রচনার সূচনা হয়। পাঠ্যপুস্তকের দুটি স্তর- একটি প্রাইমারি আর অন্যটি উচ্চতর শিক্ষা। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সূচনা প্রাইমারি স্তর থেকে হয়নি। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সূচনা হয়েছিল উচ্চতর শ্রেণির জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে। তা ছিল ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে। এগুলো বেশিরভাগ বয়স্কদের পাঠের উপযোগী ছিল। বাঙালি শিশুদের ভাষা শিক্ষার উপযোগী কোনো বই উনিশ শতকের প্রথম দশকে রচিত হয়নি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে শিশুর হাতে তুলে দেওয়ার মতো কোনো বই তখন ছিল না। এ ধরনের বইকে বলা হয় প্রাইমার। শিশু এই বইয়ের সাহায্যে ধ্বনি ও বর্ণের সম্পর্কটি বুঝতে শেখে। ধাপে ধাপে বর্ণযোজনা, শব্দগঠন ও বাক্যগঠন করতে শেখে। ১৮১৬ সালের আগে এ ধরনের বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৮১৬ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা *লিপিধারা* নামক একটি প্রাইমার বের করেন। জেমস লঙের মতে এটি বাংলা বর্ণশিক্ষার প্রথম বই। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল বারো। উনিশ শতকে প্রাইমারগুলো প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তখন প্রাইমার প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উপকরণ ছিল, এখনও তাই আছে। বাংলা ভাষায় লিপি মুদ্রণ বা বাংলা ভাষায় প্রাইমার রচনার প্রধান কৃতিত্ব শ্রীরামপুর মিশনারিদের। তাঁরা সারাদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁদের রচিত লিপিধারা বাংলা ভাষার প্রথম প্রাইমার। এরপর বাংলা ভাষায় প্রাইমার রচনার ধারা অব্যাহত থাকে। প্রাইমার কেউ সংগ্রহে রাখে না, কালের স্রোতে হারিয়ে যায়। এরপরও আশিস খাস্তগীর প্রায় ৫০০ টি প্রাইমারের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ* বইটিতে। মূলত উনিশ শতকের শুরুর দিকে নিয়মবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পড়াশোনা শুরু হয়। ১৮১৭ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটির প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে অ্যাপেনডিক্স নং-১ এ বলা হয়েছে “New Institutions in Calcutta for the promotion of education, extention and improvement of education.” তার পরের বছর ১৮১৮ সালে কলকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি স্থাপিত হয়েছিল ভারতীয়দের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির জন্য- Promoting the moral and intellectual improvement of our Indian fellow subjects”. ১৮১৮ সালে সংস্থাটির বার্ষিক সভা হয়েছিল। সে সভায় বার্ষিক রিপোর্টে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটিকে ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটির সিস্টার এসোসিয়েশন বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুটি বাংলাভাষীদের পাঠ্যপুস্তক তৈরির উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। তাছাড়া সে সময় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে যে যে প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে নিচে সংক্ষেপে সে সব প্রতিষ্ঠানের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

১৮১৭ সালের ৬ই মে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশে প্রবল গতি সঞ্চার করে। তার প্রমাণ মাত্র চার বছরে শুধু বাংলা ভাষায় উনিশটি বইয়ের ৭৯৭৫০ কপি প্রকাশিত হয়। ১৮১৭ সাল থেকে ১৮২১ সালের মধ্যে এগুলো ছাপা হয়েছিল। তাছাড়া এ সময়ে আরও বারোটি বইয়ের ২৭০২৫ কপি ছাপার প্রস্তুতি চলছিল।

১৮১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের তালিকা পাওয়া যায়। ঐ তালিকার প্রথম বই জেমস স্টুয়ার্টের *বর্ণপরিচয়*। জেমস স্টুয়ার্ট বর্ধমানে প্রভিনশিয়াল ব্যাটেলিয়ানের অ্যাডজুট্যান্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। যদিও স্কুল বুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদনে (১৮১৮) শ্রীরামপুর মিশনারিদের কাছ থেকে লিপিধারা ও বানান বই ক্রয়ের বিবরণ আছে। সোসাইটি মে ও স্টুয়ার্টের তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর মিশনারিদের কাছ থেকে আরও যে সব বই ক্রয় করে তা নিম্নরূপ:

1. Gonito (Arithmetic)-127 (গণিত)
2. Lipidhara (Rules of writing)-124 (লিপিধারা)
3.Soobhoncorerita arjya (letters of Bengalees)-475 (শুভঙ্করের আর্যা)
4. Alphabetical tables-20 ()
5. Banano (sylalabic tables-20) (বানান)
6. Phalas (tables of compound letters)-40 (ফলা)
7. Hitopodesh (moral tables)-50 (হিতোপদেশ)
8. Bhugol-4 (ভূগোল)
9. Gooroo Sishya (dialogues)-7 (গুরু- শিষ্য কথোপকথন)
10. Geography (A summary of Geography)-100

১৮১৬ সালে জেমস স্টুয়ার্ট বর্ধমানে যে সকল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে উল্লিখিত বইগুলো পাঠ্য ছিল। এই বইগুলো ১৮১৭ সালের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। জেমস স্টুয়ার্টের সুপারিশে বইগুলো তাঁর স্থাপিত স্কুলগুলোতে পড়ানো হতো। *লিপিধারা*তে লিখনরীতি শেখানো হতো। বানান ও যুক্তাক্ষরের বইগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বর্ণপরিচয় করানো হতো। আলাদাভাবে ছাপা না হয়ে এ দুটি বই একসাথে ছাপা হলে এক প্রাইমার হিসেবে গণ্য করা যেতো। এই বইগুলো স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের আগে ছাপা হয়েছিল। তবে এগুলো - কোথায় কখন ছাপা হয় বা এগুলোর লেখক ও প্রকাশক কারা সে সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়নি। তবে এটা নিশ্চিত যে ১৮১৭ সালের আগে লিপিশিক্ষা ও বানান-শিক্ষার জন্য কিছু বই বেরিয়েছিল। তাই এটা বলা যায় স্টুয়ার্টের বইটি বাংলা বর্ণশিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা নয়। জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত স্কুল বুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে (১৮১৮) সাতটি পাঠযুক্ত স্টুয়ার্টের বইটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিবেদনে আরও চারটি পাঠ সংযুক্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার এগারোটি পাঠ একত্রে ছাপা হয়। সংস্থাটির তৃতীয় রিপোর্টে বইটির ব্যাপক চাহিদার তথ্য পাওয়া যায়। সে সময়ে ছাত্রপাঠ্য প্রাইমার গ্রন্থ ছিল না। বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে ১৮১৭ সাল থেকে ১৮২১ সাল পর্যন্ত বইটি তিন হাজার আটশত পঞ্চাশ কপি ছাপা হয়। এর মূল্য ছিল আট আনা। ১৮১৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে :"The set was made more complete by the addition of four other tables prepared by and printed for the Sreerampore Missionaries of which the society took 750 copies. Of the whole eleven, a fresh edition of 100 copies has recently been printed for the society at Sreerampore press."সেকালে বাংলার শিক্ষানুরাগী সমাজে বইটি সমাদৃত হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশন এর

অনেকগুলো কপি ক্রয় করে। স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় বইটিতে উনিশটি টেবিল ছিল- যা নিম্নরূপভাবে সাজানো ছিল:

No-1 Alphabet and Digits(বর্ণমালা ও সংখ্যা)
No-2-6- Banan- O- Phalas and etc(বানান ও ফলা)
No 7-13- Spelling- 0ne and two syllables (একাক্ষর ও দ্ব্যক্ষর)
No 14- 19- Spelling- three syllables (ত্র্যক্ষর)

প্রথম পাঠে স্বরবর্ণ ও সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পাঠে বানান শিখানো হয়। বর্ণগুলোর ব্যবহার শেখানোর পর নীতিকথা ও উপদেশমূলক গল্প যোগ করে দেওয়া হয়। শিশু-মনে নীতিবোধ ও আদর্শ চরিত্র গঠনই এর উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী প্রাইমারগুলোতেও স্টুয়ার্টের এই ছকটি অনুসৃত হয়েছে। বিশেষত বিদ্যাসাগর ও তাঁর পরবর্তী লেখকেরা এই ধারাটি অনুসরণ করেছেন। তাঁরা প্রথমে বর্ণমালা ও পরে নীতিশিক্ষামূলক গল্প যোগ করেছেন। বইটি আট নয় বছর প্রথম প্রাইমার গ্রন্থ হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু এই বইটি পরবর্তীকালে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' নামক সিরিজ গ্রন্থে বইটির নাম উল্লেখ করেছেন তবে তিনি নিজে বইটি দেখেছেন কি না এই ব্যাপারে কিছু লেখেননি। সোসাইটির ১৮২৩ সালের ষষ্ঠ রিপোর্টে ১৮২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত সব বইয়ের কপি পাঠানোর কথা বলা হলেও কোথাও এই বইটির হদিশ পাওয়া যায়নি। তবে 'উপদেশ কথা' স্টুয়ার্টের রচিত একটি গল্পগ্রন্থ যা সোসাইটি ১৮২০ সালে প্রকাশ করে।

১৮২০ সালে স্কুলবুক সোসাইটি শিশুপাঠ্য বিষয়ক আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। বৃহৎ কলেবরের বইটির নাম *বাঙ্গালা শিক্ষা গ্রন্থ* এবং এর লেখক রাধাকান্ত দেব। এতে মোট ২৮৮ টি পাতা ছিল। ১৮২১ সালে অনুষ্ঠিত স্কুল বুক সোসাইটির চতুর্থ অধিবেশনে এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে যোগেশচন্দ্র বাগল এটির প্রকাশকাল ১৮২১ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য সাধক চরিতমালা (কুড়ি খণ্ডে) গ্রন্থে এই মত দেন। কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থটির আখ্যানপত্রে এর প্রকাশকাল ১৮২০ সালই লেখা আছে। ছাত্র পাঠ্যপুস্তক হিসেবে এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। লেখক তাঁর নিরক্ষর দেশবাসীকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থটি লিখেছিলেন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে দেশবাসীকে শিক্ষিত না করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। ১৮২৭ সালে এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বের হয়েছিল।

বাঙালা শিক্ষা গ্রন্থে প্রথমে বর্ণমালা- স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ শেখার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুক্তাক্ষর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় ত্র্যক্ষর ও সপ্তম পৃষ্ঠায় চতুরক্ষরযুক্ত বানান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অষ্টম পৃষ্ঠা থেকে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বর্ণের নামকরণ করা হয়েছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদসমূহে একে একে বর্ণ, ধ্বনি, পদ, বিবৃত, হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পনেরো থেকে ঊনত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিভিন্ন শব্দের বানান দেওয়া

আছে। স্বর ব্যঞ্জনযুক্ত দ্ব্যক্ষর শব্দ, কাদ্যাদি 'অ' মধ্য দ্ব্যক্ষর শব্দ, 'আ' কার মধ্য দ্ব্যক্ষর শব্দ, 'ই' কার যুক্ত দ্ব্যক্ষর শব্দের পাঠ দেওয়া হয়েছে। রাধাকান্ত দেব কাদ্যাদি 'অ' কার মধ্য কিছু শব্দের উদাহরণ দিয়েছেন- কচ, কট, কণ, কত ইত্যাদি।[৯]

১৮৩৫ সালে স্ট্যানহোপ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরচন্দ্র বসুর 'শব্দসার' বের হয়। বাঙালি রচিত এটিই বর্ণশিক্ষার প্রথম বই। তারপর মিশনারিদের লেখা 'বঙ্গ বর্ণমালা' নামে পাঠযুক্ত বাংলা বর্ণশিক্ষার একটি গ্রন্থ বের হয়। পরের পাঁচ বছরে আর কোন প্রাইমারের দেখা মেলেনি। ১৮৩৯ ও ১৮৪০ সালে স্থাপিত হলো যথাক্রমে হিন্দু কলেজ পাঠশালা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। এই পাঠশালা দুটিতে স্টুয়ার্টের বই পড়ানো হতো না। ফলে প্রয়োজন দেখা দিল নতুন প্রাইমারের। হিন্দু কলেজ পাঠশালার শিশুদের জন্য রচিত হল *শিশুসেবধি* সিরিজ। প্রথম প্রাইমার লেখার কৃতিত্ব বিদেশিদের হলেও ধাপে ধাপে বর্ণশিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সিরিজ পরিকল্পনার কৃতিত্ব বাঙালির। এ ধারার প্রথম লেখক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রামচন্দ্র প্রথম দুটি খণ্ড লেখেন। এই সিরিজের তিনটি গ্রন্থ বেরিয়েছিল। তৃতীয়টির লেখক সম্পর্কে জানা যায়নি। তিন খণ্ডই বেরিয়েছিল ১৮৪০ সালে ব্রজমোহন চক্রবর্তীর প্রজ্ঞাযন্ত্র থেকে। পরবর্তীকালে আশিস খাস্তগীর ছয়টি *শিশুসেবধি* থাকার কথা বলেছেন। শিশুসেবধি 'বর্ণমালা-১' পাওয়া যায়নি। ছয়টির মধ্যে *শিশুসেবধি*-২ ও *শিশুসেবধি*-৩ পাওয়া গিয়েছে- যার পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ৫৬ ও ২১। বাকি চারটি ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগের সম্পাদিত সংস্করণ। হিন্দু কলেজ পাঠশালার শিক্ষক ক্ষেত্রমোহন দত্ত এই সিরিজের বর্ণমালা-১ (৯ম সং, ৫৪), বর্ণমালা-২ (৮ম সং, ৫৩) ও বর্ণমালা-৩ (৫ম সং, ৫০) তিনটি খণ্ডের সম্পাদনা করেন।

নতুন বর্ণমালা নামে দুই খণ্ডের প্রাইমার লেখা হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী সভার পাঠশালার শিশুদের জন্য। ১৮৪০ সালে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় আর ১৮৪৪ সালে বের হয় দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮৪১ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারি 'জ্ঞানারুণোদয়' নামে একটি প্রাইমার বের করে। ১৮৪৬ সালে স্কুল বুক সোসাইটি ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের 'বর্ণমালা'র ২টি খণ্ড নতুনভাবে প্রকাশ করে।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রাইমারের নব যুগের সূচনা হয়। ঐ বছর কলকাতায় বেথুনের ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্যবইয়ের অভাব পূরণ করতে মদনমোহন তর্কালঙ্কার লেখেন *শিশুশিক্ষার* প্রথম তিন ভাগ, এগুলোর আখ্যাপত্রে লেখা ছিল 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ' কথাটি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চতুর্থ ভাগ *বোধোদয়* লেখেন, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন *নীতিবোধ* নামক পঞ্চম ভাগটি। পরবর্তীকালে *বোধোদয়* ও *নীতিবোধ* নিজস্ব নামে স্বীকৃতি পেয়েছিল; তবে মদনমোহন রচিত তিন খণ্ড *শিশুশিক্ষা* নামেই রয়ে যায়। বাঙালি রচিত বাংলা প্রাইমারের দ্বিতীয় সিরিজ হল 'শিশুশিক্ষা'। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন 'বইটি যেন শিশুশিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে আধুনিকতার অরুণালোকে নিয়ে এল।' এটি বেথুন স্কুলের জন্য লেখা হলেও এর খ্যাতি বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে বহু বছর শিশু শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে ছিল 'পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল'সহ অন্যসব রচনা।

১৮৫০ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর বেশ কয়েকটি বর্ণমালা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এসব গ্রন্থের লেখকদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তবে এগুলো ছাপা হয়েছিল সত্যার্ণব প্রেস, কবিতা রত্নাকর যন্ত্র, চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্র, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, বিশপ কলেজ প্রেস থেকে। এছাড়া বোমওয়েচ *ধ্বনিধারা*(১৮৫৩), জে. ইয়ুল *শিশুবোধক*(১৮৫৪) নামক প্রাইমার লেখেন। কিন্তু এই বইগুলোর আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না, সবই পুরোনো ধারার অনুকৃতি। তবে এ সময়ে ব্যতিক্রম ছিল অক্ষয়কুমার দত্তের *চারুপাঠ*। বর্ণপরিচয়ের মত ব্যাপক প্রসিদ্ধি না পেলেও এটি ছিল সেকালের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এর তিনটি খণ্ড ছিল। ১৮৫২ সালে প্রথম খণ্ড, ১৮৫৪ তে দ্বিতীয় খণ্ড এবং ১৮৫৯ সালে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

১৮৫৫ সালে বাংলা প্রাইমারের জগতে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। তাঁর *বর্ণপরিচয়* প্রথম ভাগ বাংলা প্রাইমারকে বিশিষ্টতা দান করে। বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। বাংলা বর্ণশিক্ষার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটিকে এখনও আদর্শ ধরা হয়। কালজয়ী এই প্রাইমার সম্বন্ধে আশিস খাস্তগীরের মূল্যায়ন- ‘বিদ্যাসাগর বাঙালিকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন অনেক দূর। মদনমোহনের কাব্যসুরভি বর্জন করে নির্মেদ, যুক্তিশীল ও সুঠাম গদ্যের ভঙ্গিতে দেখা দিলো বর্ণপরিচয়। মদনমোহনের *শিশুশিক্ষা* কবি রচিত আর গদ্যকারের লেখা প্রাইমার হল *বর্ণপরিচয়*। ১৮৫৫ সাল থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে আরও প্রায় পঁচিশটি প্রাইমার প্রকাশিত হয়। এই দশ বছরে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি সাতকড়ি দত্তের প্রথম *পাঠ* (১৮৬২ ?, নবম সং, ১৮৬৭), দ্বিতীয় *পাঠ* (১৮৬২), তৃতীয় *পাঠ* (১৮৬২ ?, ৩য় সং-১৮৬৫)।

১৮৬৬ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরে ছাপা প্রাইমারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বর্ণশিক্ষা -১/২* (১৮৬৭, হিতৈষী প্রেস), রামগতি ন্যায়রত্নের *শিশুপাঠ* (১৮৬৫, বুধোদয় প্রেস), মথুরানাথ তর্করত্নের *বর্ণবোধ* (১৮৬৯, প্রাকৃত প্রেস), মহ. জুহুরুদ্দিনের *জ্ঞানশিক্ষা* (১৮৬৯, সুলভ প্রেস), হারানচন্দ্র রাহার *বর্ণবিজ্ঞান ১ম ও ২য়* (১৮৭০, সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেস) গ্রন্থগুলো। এছাড়া তিনভাগে বর্ণপরীক্ষা লিখেছেন হীরালাল মুখোপাধ্যায়। এ পর্বে আরও যাঁরা প্রাইমার লিখেছেন তাঁদের মধ্যে শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (*শিশুপাঠ)*, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (*শিশুরঞ্জিকা*, সুলভ প্রেস), অমরনাথ সরকার (*শিশুপাঠ-১*, সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেস), ভুবনমোহন ভট্টাচার্য (*বর্ণশিক্ষা*, জে.জি. চ্যাটার্জিস প্রেস) উল্লেখযোগ্য।[১০]

পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত *বাল্যশিক্ষা* নামক একটি প্রাইমার ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল। রামসুন্দর বসাক প্রথম এই প্রাইমারটি রচনা করেন। ১৮৭৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় এটি। সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রণে প্রায় তিন হাজার কপি ছাপা হয়েছিল। গ্রন্থটি প্রথমে সুলভ প্রেস পরে অন্যান্য প্রেস থেকেও বের হয়। এতে বর্ণমালা, অসংযুক্ত ও যুক্তাক্ষরে শব্দগঠন, শব্দসহ উদাহরণ, গদ্যে পদ্যে সহজ দ্রুত পাঠ ও শিশুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য বেশ কিছু ছবি যুক্ত রয়েছে। শেষের দিকে আছে বাংলা সন তারিখের হিসাব, নামতা ইত্যাদি। গ্রন্থটি এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে কিছু দিন পর গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ছাপা হতে শুরু করে।[১১]

উনিশ শতকে প্রাইমার কেবল বালকদের লক্ষ্য করে লেখা হতো। শিশু বলতে বালকদের বোঝানো হতো। কখনও কখনও নামকরণ থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যেতো। যেমন বালকশিক্ষা বা বালকরঞ্জন বর্ণমালা। এমনকি স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত প্রথম প্রাইমার শিশুশিক্ষায়ও 'বালিকা' শব্দটি নির্দেশিত হয়নি। তবে কয়েকটি গ্রন্থ বালিকা শব্দযোগে নামকরণ হয়েছিল। যেমন-১৮৬৩ সালে অজ্ঞাত লেখকের *বালিকাবান্ধব* বইটি প্রকাশিত হয়। তাছাড়া বালিকাদের জন্য প্রথম মহিলা প্রাইমার রচয়িতা প্রতুলকুমারী দাসীর *বালিকা বোধিকা* প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৭ সালে। ১৮৮০ সালে আরও কয়েকজন মহিলা লেখিকার নাম পাওয়া যায়।[১২]

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে স্কুলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও স্কুল স্থাপিত হয়। ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যবইয়ের চাহিদাও তৈরি হয়। ১৮৭১ থেকে ১৮৭৫ সাল এই পাঁচ বছরের সময়সীমার মধ্যে প্রায় ৫০টির মতো প্রাইমার বের হয়েছে, পুনর্মুদ্রিত হয়েছে আরও প্রায় ২৫টি। চাহিদার কারণে এ সময়ে একশ্রেণির লেখক ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রাইমার লিখতে শুরু করেন। কেউ বিদ্যাসাগর, কেউ মদনমোহনকে অনুসরণ করেছেন- কেউবা হুবহু লেখকদ্বয়ের বই নিজ নামে চালিয়ে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ মধ্যপন্থী ছিলেন– কিছুটা নিয়েছেন মদনমোহন থেকে, কিছুটা বিদ্যাসাগর থেকে। রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী (*নববর্ণপরিচয়*-১, ২) ও মদনমোহন সরকার (*বালকশিক্ষা*-১) বিদ্যাসাগরপন্থী। সাধারণত প্রাইমারগুলোর পৃষ্ঠাসংখ্যা দশ থেকে পঞ্চাশ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু এ সময়ে বর্ধিত কলেবরে প্রাইমার বের হলো। প্রায় ১০০ পৃষ্ঠার *বর্ণপরীক্ষা* (১৮৭৩, বিজয়রাজ প্রেস) লেখেন হীরালাল মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের *নবশিশুবোধ* (১৮৭৪, জে.জে. চ্যাটার্জিস প্রেস) এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৪। এরকম অন্যান্য লেখকের শতাধিক পৃষ্ঠার প্রাইমার তখন বের হয়। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত *বর্ণপরিচয়* এর মাধ্যমে বাংলা প্রাইমারের নবযুগের সূচনা হয়েছিল। বাংলা বর্ণশিক্ষায় এ গ্রন্থের প্রভাব এখনও বিদ্যমান। মূলত *বর্ণপরিচয়*-ই ১৮৫৫ পরবর্তী বাংলা প্রাইমারের ধারাটি নিয়ন্ত্রণ করেছে। তবে এ বইয়ের জনপ্রিয়তাকে অসৎ উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করেছেন অনেকে। *বর্ণপরিচয়*কে হুবহু নকল করে নিজ নামে চালিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতে ঘটেছে এ ঘটনা। আর এই ঘটনা প্রমাণ করে বাংলা প্রাইমার ও অন্যান্য পাঠ্যবইয়ের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছিল তখন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যবই লিখিত হয়। উনিশ শতকে পাঠ্যপুস্তক রচনার যে গতি তৈরি হয়েছিল তা পরবর্তী একশ বছরে আরও বেগবান হয়েছে।

শিশুপাঠ্য বর্ণশিক্ষার বই সবচেয়ে বেশি বের হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে। কেবল ১৮৮০ সালে পঞ্চাশটি প্রাইমার বের হয় নতুন ও পুনর্মুদ্রণ মিলিয়ে। ১৮৭৬ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরে নতুন ও পুরোনো কমপক্ষে পঁচাত্তরটি প্রাইমার বের হয়। অক্ষয় কুমার রায়ের বর্ণের পরিচয় (২ ভাগ), উদয়কৃষ্ণ দত্তের নব শিশুপাঠ (৩ ভাগ), উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নব শিশুশিক্ষা (৩ ভাগ), দুর্গাচরণ গুপ্তের গুপ্তপ্রেস বর্ণমালা (৩ ভাগ), দ্বারকানাথ পালের শিশুশিক্ষা, মদনমোহন সরকারের বালকশিক্ষা (২ ভাগ), মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষাসোপান, রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীর নববর্ণপরিচয় (২ ভাগ),

রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর অক্ষরশিক্ষা (২ ভাগ), রামরূপ চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণপরিচয় (২ ভাগ), শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শিশুবোধ (২ ভাগ), শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণবিবেক (২ ভাগ), শ্রীনাথ কুন্তীর বর্ণরঞ্জন ইত্যাদি এ সময়ে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রাইমার।[১৩]

৫. উপসংহার

উনিশ শতকের শুরুতেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। যদিও এই গ্রন্থগুলো শিশুপাঠ্য বা স্কুলপাঠ্য ছিল না তবুও এই পাঠ্যপুস্তকগুলো পরবর্তীকালের শিশু পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে আসে। যে সমাজে বা যে সময়ে পাঠ্যপুস্তকের ধারণাই নেই সে সমাজে বা সময়ে শিশু বা বয়স্ক কোনো পাঠ্যপুস্তক না থাকাই স্বাভাবিক। যে সমাজে বয়স্কদের ভাষা শিক্ষা উপযোগী মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল না, সে সমাজে শিশু পাঠ্য বইয়ের আশা করা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই বাংলা বইয়ের আলোচনা করতে হলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজই ভাষা শিক্ষাকে শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে। পরবর্তীকালে মিশনারিদের উদ্‌যোগে বাংলা ভাষায় শিশুপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক বা প্রাইমার রচনার সূত্রপাত হয়। পাঠ্যপুস্তকের যুগ শুরু হয় **১৮১৭** সালে। **১৮১৭** সালের জানুয়ারি মাসে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছরের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। তার পরের বছর **১৮১৮** সালে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি গঠিত হয়। শেষোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার ধারা বেগবান হয়।

তথ্যসূচি:

---

[১] পরমেশ আচার্য, *বাঙালীর শিক্ষাচিন্তা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১১), পৃ. ১৫৪-১৫৮
[২] সজনীকান্ত দাস, *বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫), পৃ. ৯৪
[৩] তদেব, পৃ. ১৬৪
[৪] তদেব, পৃ. ১৬৫-১৬৯
[৫] যোগজীবন গোস্বামী, *বাংলা পাঠ্য পুস্তকের ইতিহাস* (কলকাতা: এন.ই. পাবলিশার্স, ২০০৮), পৃ. ২৫
[৬] তদেব, পৃ. ২৪-২৬
[৭] তদেব, পৃ. ২৭-২৮
[৮] কাজী শহীদুল্লাহ, অনু.আবদুল মমিন চৌধুরী, *পাঠশালা থেকে স্কুল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ১৭-২৪
[৯] যোগজীবন গোস্বামী, *বাংলা পাঠ্য পুস্তকের ইতিহাস* (কলকাতা: এন.ই. পাবলিশার্স,২০০৮), পৃ.৪৩-৫৬
[১০] আশিস খাস্তগীর সম্পা.,*বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬), পৃ. ১৪-১৭
[১১] আশিস খাস্তগীর (সম্পা), *শিশুশিক্ষা-মদনমোহন তর্কালঙ্কার* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯), পৃ. ৩৫-৩৬
[১২] তদেব, পৃ. ৩৭-৩৮
[১৩] আশিস খাস্তগীর সম্পা., বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯।